Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 287 – 294
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

চণ্ডীদাসের রাধা তারাশঙ্করের রাধা : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

রাহুল ঘোষ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
ইমেইল : ghoshrahul1294@gmail.com

Keyword
'ত্রিপত্র', বেঙ্গল লাইব্রেরী, ছ' আনা, গ্রন্থনির্মাণ ও মুদ্রণসংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ, ঘাটের কথা, 'পাষাণের প্রতি', রাধার কৃষ্ণ, 'মুগ্ধবাণী', কথাসাহিত্য।

Abstract
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ; নাম—'ত্রিপত্র'। বইটিতে প্রকাশকালের কোনো উল্লেখ নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরীর মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ষাট পৃষ্ঠার গ্রন্থ। মূল্য ছিল ছ' আনা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই কাব্যগ্রন্থটি আসলে বাংলা কবিতার রেডবুক। মজা করে বলছি। আসলে কাব্যগ্রন্থটি লাল কালিতে ছাপা হয়েছিল। বর্তমানে মূলত লাল কালিতে ছাপা হয় কিছু বটতলার বই; দেব-দেবীর পাঁচালি বিষয়ক। এই বিষয়টির মাধ্যমে আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছি যুবক তারাশঙ্করের আগ্রহের অন্যতম বিষয় ছিল গ্রন্থনির্মাণ ও মুদ্রণসংস্কৃতি। এই কাব্যটি তিনটি অধ্যায় বা পত্রে বিভক্ত। আমরা ধরে নিতে পারি যে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি তারাশঙ্করের পনেরো থেকে আটাশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। দ্বিতীয় পত্রের নাম কবি রেখেছেন—'মর্মবাণী'। স্বভাবতই আমরা বুঝতে পারছি গোপন হৃদয়ের ব্যথা ও কথা ধ্বনিত হবে এই অধ্যায়ে। 'মর্মবাণী' অধ্যায়ে কবি লিখেছেন বিশুদ্ধ কিছু প্রেম ও বিরহের কবিতা। এক্ষেত্রে রূপক চরিত্র হিসাবে কবি গ্রহণ করেছেন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে। কবি আশ্রয় করেছেন শ্রীমতী রাধিকার বয়ান। এই অধ্যায়ের বেশিরভাগ কবিতাতেই শ্রীমতীকে ভবন বিরহে অবস্থান করতে দেখি। "নিশীথে" কবিতায় আমরা দেখি রজনীর কালো মেঘ দেখে রাধিকার কৃষ্ণের কথা মনে পড়ছে। তাঁর চোখে নিদ্রা নেই। অনেক মিনতির পর যখন মেঘ থেকে বৃষ্টি হল তখন শান্ত হল ধরণী। ধরণীরূপ রাধিকারও যেন মিলনতৃষ্ণা প্রশমিত হল। রাধার কৃষ্ণের প্রতি কোনো দোষারোপ নেই। কৃষ্ণ হয়ত ছলনা করে ঘুমের মধ্যে রাধিকাকে একা রেখে ত্যাগ করে চলে গেছে তবু রাধিকার কোনো অভিযোগ নেই। "বাঞ্ছিত" কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি রাধিকা বলছেন তিনি যে কৃষ্ণ মন্ত্র পেয়েছেন তাতেই খুশি। তিনি কৃষ্ণ ভজনা করেই তৃপ্ত থাকতে চান। এই কৃষ্ণ ভজনার মাধ্যমেই কৃষ্ণের অস্তিত্ব টের পাবেন এই আশায় রয়েছেন শ্রীমতী। তারাশঙ্করের

প্রথম পর্বের কবিতাতে রয়েছে বর্ণনার প্রাধান্য। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ আমরা সেখানে লক্ষ্য করি। মধ্যপর্বের কবিতা আসলে নব-বৈষ্ণব পদাবলি। অর্থের শব্দ, অতি পর্ব এবং কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ এই পর্বে অতি নিপুণভাবে করেছেন কবি। চণ্ডীদাসের রাধা জানেন কৃষ্ণ ছাড়া তার কোনো গতি নেই। ওঁর ইহকাল, পরকাল সব কৃষ্ণে সমর্পিত। সে তুলনায় আমাদের মনে হয় তারাশঙ্করের রাধা অতি-স্পষ্টবাদী। হবেই বা না কেন। মনে রাখতে হবে আধুনিকতার মূল বৈশিষ্ট্য প্রশ্ন করা। যেটা বারেবারে করতে পেরেছেন তারাশঙ্করের রাধা। সে তুলনায় চণ্ডীদাসের রাধা আজীবন করেছেন ত্যাগ ও সমর্পণ। অবশ্য এটাও তো অস্বীকার করবার নয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহকে আধুনিক কাব্যের বিষয় করবার সময় নিশ্চয় সহৃদয় কবির মননে ছিল চণ্ডীদাসের পদব্যঞ্জনাই।

Discussion

প্রবন্ধটার নাম হতে পারত দ্বিজ চণ্ডীদাস ও আধুনিক বাংলা কবিতা। পরে ভেবে দেখলাম লেখাটি ব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তি উভয় দোষেই দুষ্ট হতে পারে। কারণ আধুনিক বাংলা কবিতায় কিয়দংশক কবির কাব্যেই চণ্ডীদাসের পদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্তমান। অপরদিকে আধুনিক ভারতীয় কবিতায়; বিশেষত হিন্দি সাহিত্যে চণ্ডীদাসের পদের প্রত্যক্ষ প্রভাব আমার দৃষ্টিতে বহুলভাবে নজরে এসেছে। সেই বিষয়ে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে। তবে আমাদের মূল আলোচনায় বাংলা কবিতার আধুনিকায়ন গুরুত্ব পাবে। দ্বিতীয় যে বিষয়টি মস্তিষ্কে কড়া নাড়ল সেটি হল স্থানীয় ইতিহাস চর্চা। পোস্ট কলোনিয়াল অঞ্চলের বর্তমান কাব্য-কবিতা বিষয়ে আলোচনা করলে বোধহয় স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় হস্তক্ষেপ করা হয়। এই বিষয় দু'টি স্মরণে রেখেই আজকের এই আলোচনা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ওঁর রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-তে চারবার লিখেছেন: চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের গীত আস্বাদন করতেন। অন্ত্যলীলার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ 'কূর্মাকারোন্মাদপ্রলাপো' অধ্যায়ে লিখেছেন—

"যবে যেই ভাব প্রভুর করএ উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়।।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পঢ়ে যায় রামানন্দ।।"[১]

অপরদিকে জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল'-এর আদিখণ্ডে বন্দনা অংশে জানিয়েছেন—

"শ্রী ভাগবত করিল ব্যাস মহাশয়
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
কৃষ্ণের চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ।"[২]

বিশ্বভারতী পুথিশালার ৩৬৮ নম্বর পুথিটির নাম 'কবিগান'। রচয়িতার নাম নেই। পরিগ্রহণ সংখ্যা ৫৩২২। এই পুথির লিপিকাল ৩ মাঘ ১১৮২ বঙ্গাব্দ। এই পুথির কিয়দংশ উদ্ধৃতিযোগ্য বলে মনে করি।

"পূর্বে গ্রামেতে ছিলা কবি দ্বিজ চণ্ডিদাস।
করিস্বাহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্জাস।।
তাহার পুজিৎ আছেন দেবি বিশালাক্ষী।।
সেই পাদপদ্ম মোই হৃদে করি থাক্কি।।
ইষ্টদেবের য়ার্শীবাদ আর রমণির কৃপাতে।
রচিল পয়ার গ্রন্থ ভাবিয়া মনেতে।।
শিশুমতি অল্পবুদ্ধি কি বর্ন্নিতে পারি।

সত্যের আনন্দে বন্দ মুখে বল হরি।।"[৩]

চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়মূলক পদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন। অতএব তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ের পদকর্তা। চৈতন্যদেবের সময়কাল ১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ। জীবনীকার সুবলচন্দ্র মিত্র 'সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকার পৌষ ১৩১৩ সংখ্যায় "জীবনচরিত সঙ্কলন" শীর্ষক; ধারাবাহিক প্রকাশিত চরিতাভিধানে চণ্ডীদাস সম্পর্কে জানান— "ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক এবং চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী।"[৪] অপরদিকে ঐতিহাসিক ভূদেব চৌধুরী 'বাংলা সাহিত্যর ইতিকথা' গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ে আমাদের অবগত করিয়েছেন— "খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষভাগে কোনো সময়ে জন্ম গ্রহণ করে পঞ্চদশ শতকের অন্তত ষষ্ঠ বা সপ্তম দশক পর্যন্ত বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন।"[৫] অতএব চণ্ডীদাসের সময়কাল অনুমান করা যেতে পারে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক-পঞ্চদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক; এবং অবশ্যই তিনি চৈতন্য জন্মের পূর্বে প্রয়াত হন। প্রয়াণের পর বেশ কয়েক বছর সময় নিশ্চয় অতিবাহিত হয়েছিল, চণ্ডীদাসের পদ-প্রচারের ব্যাপ্তিকাল হিসাবে। আমাদের আলোচনায় আমরা চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, "বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাস" ভণিতাযুক্ত কিছু নির্বাচিত পদেরই আলোচনা করব।

দুই

চণ্ডীদাসের প্রয়াণের প্রায় সাড়ে চারশো বছর পর, লাভপুরের তরুণ যুবক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিপত্র' প্রকাশিত হয়। বইটিতে প্রকাশকালের কোনো উল্লেখ নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরীর মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ষাট পৃষ্ঠার গ্রন্থ। মূল্য ছিল ছ' আনা। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল নাট্যকার নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই কাব্যগ্রন্থটি আসলে বাংলা কবিতার রেডবুক। মজা করে বলছি। আসলে কাব্যগ্রন্থটি লাল কালিতে ছাপা হয়েছিল। বর্তমানে মূলত লাল কালিতে ছাপা হয় কিছু বটতলার বই; দেব-দেবীর পাঁচালি বিষয়ক। এই কাব্যটি তিনটি অধ্যায় বা পত্রে বিভক্ত। প্রথম পত্র: পাষাণের বাণী। দ্বিতীয় পত্র: মর্মবাণী। তৃতীয় পত্র: মুগ্ধবাণী। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন চন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। বি লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। মুদ্রাকর ছিলেন কানাইলাল দাস। ইকনমিক্যাল প্রেস, ২৩ মৃজাপুর লেন, কলিকাতা থেকে মুদ্রিত।

আমরা ধরে নিতে পারি যে এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি তারাশঙ্করের পনেরো থেকে আটাশ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। এই সময়ের বহুপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের *ঘাটের কথা*, *রাজপথের কথা*, *ক্ষুধিত পাষাণ* প্রভৃতি গল্পগুলি। আমরা এটাও ধরে নিতে পারি যে, উভয়েই বীরভূমে দীর্ঘদিন অবস্থান করার সুবাদে যুবা বয়সে তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের এই গল্পগুলি পড়েছেন। তাই হয়ত প্রথম পত্রের কবিতাগুলিতে রাবীন্দ্রিক গল্পের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি কবি। তারাশঙ্করের প্রথম পত্রের কবিতাগুলিতে রয়েছে 'কথা'-র প্রাধান্য। কথক কবি নিজেই। দ্বিতীয় পত্রের নাম, কবি রেখেছেন— 'মর্মবাণী'। স্বভাবতই আমরা বুঝতে পারছি গোপন হৃদয়ের ব্যথা ও কথা ধ্বনিত হবে এই অধ্যায়ে। 'মর্মবাণী' অধ্যায়ে কবি লিখেছেন বিশুদ্ধ কিছু প্রেম ও বিরহের কবিতা। এক্ষেত্রে রূপক চরিত্র হিসাবে কবি গ্রহণ করেছেন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে। কবি আশ্রয় করেছেন শ্রীমতী রাধিকার বয়ান। এই অধ্যায়ের বেশিরভাগ কবিতাতেই শ্রীমতীকে ভবন বিরহে অবস্থান করতে দেখি।

তিন

"নিশীথে" কবিতায় আমরা দেখতে পাই রজনীর কালো মেঘ দেখে রাধিকার কৃষ্ণের কথা মনে পড়ছে। তাঁর চোখে নিদ্রা নেই। অনেক মিনতির পর যখন মেঘ থেকে বৃষ্টি হল তখন শান্ত হল ধরণী। ধরণীরূপ রাধিকারও যেন
মিলনতৃষ্ণা
প্রশমিত হল—

"রজনীর ওই কালো কোলে

ওই কালো মেঘ আসে ছেয়ে।
আদ্র বায়ু করি হাহাকার
বয়ে যায় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে।।
আমার মন্দিরে আমি একা
চেয়ে কালো আকাশের পানে
নাহি জানি কি মধু-পরশ
পেতে চাই তাপ-তপ্ত প্রাণে।।
... ...
আকাশ দিয়েছে বারিধারা
ধরণীর তৃষা তৃপ্ত হবে।।"[৬]

অপরদিকে চণ্ডীদাসের রাধাকে দেখি শ্যাম নাম শুনে শ্যাম দর্শন ইচ্ছায়, পূর্বরাগের বিভায় প্রেমে আকুল হয়ে উঠেছেন তিনি—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।।"[৭]

কিন্তু পার্থক্যটা সেখানেই যেখানে তারাশঙ্করের রাধা অপরের মিলন দেখে তৃপ্ত হতে জানেন। ধরণীর সাথে নিজ অভেদত্ব কল্পনা করতে জানেন। প্রকৃতিরূপ ধরণী; ধরণীরূপ রাধা এবং পুরুষরূপ আকাশ; আকাশরূপ কৃষ্ণর মিলন হয়েছে বৃষ্টি রূপ স্বেদ অথবা অশ্রুর মাধ্যমে। চণ্ডীদাসের রাধায় কৃষ্ণলাভেচ্ছাতে রয়েছে অতৃপ্তি। প্রকৃতির রূপক মিলন দেখেও তাঁর মিলনেচ্ছা ততটা প্রকাশ হয় না পদে, যতটা তিনি প্রত্যক্ষ কৃষ্ণসন্দর্শনে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।।" [৮]

এই দৃশ্য দেখে কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা ধরণী-আকাশের মিলনের দিকে দৃকপাত করেন না। আপনি বলবেন সম্মুখে স্বয়ং কৃষ্ণ উপস্থিত। দয়িতা কীভাবে নিজ দৃষ্টি সরাবেন অন্যত্র! এহ সত্যি।

তারাশঙ্করের রাধিকাকে আমরা দেখি "মিনতি" কবিতায় মিনতি করতে। কৃষ্ণকে রাধা অনুরোধ করছেন একটিবারের জন্য অভিসারিকার কামনাকে স্বীকৃতিদানের। যদি কৃষ্ণ রাধিকার সাথে মিলন বাসনায় আগ্রহী না হন তাহলেও ঠিক; তবু কৃষ্ণ একবার আসুন তার দরজায়। তিনি এসে একবার শুনে যান রাধা তাঁকে কতটা ভালবাসে। রাধিকার আক্ষেপ শরৎ চলে গেল, হেমন্ত পূর্ণিমার রাস বিগত তবু কৃষ্ণ মথুরা থেকে এখনো ফিরলেন না। "প্রতীক্ষায়" কবিতায় আছে সেই বেদনার কথা—

"প্রিয়জনে উপহার দিয়ে
গেল কত শরৎ চলিয়ে
দেওয়া দূর— কিছু জানালে না।
হেমন্তের পূর্ণিমায় রাস
অভিসারে ত্যজিনু আবাস

কই তুমি বাঁশী বাজালে না।

... ...

পশিতেও হবে না কুটিরে
"ভালবাসি" এ কথা দুটিরে
শুনে যাও দুয়ারেতে এসে।।"[৯]

মাথুর পর্যায়ে চণ্ডীদাসের রাধিকা এতটা দার্ঢ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি।

"সাঁজে নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
সে যে হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কারে।।" [১০]

এই পদেই তিনি বলছেন সন্ধ্যাবেলাতেই তার দীপ নিভে গেছে। অথচ তার এখনো মৃত্যু হচ্ছে না। কৃষ্ণহীন জীবনের কোনো অর্থ তার কাছে নেই। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি তারাশঙ্কর মাথুরকে কেন্দ্র করে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তাতে রাধিকা এতটা ভেঙে পড়েননি কৃষ্ণবিরহে।

চার

রাধার কৃষ্ণের প্রতি কোনো দোষারোপ নেই। কৃষ্ণ হয়ত ছলনা করে ঘুমের মধ্যে রাধিকাকে একা রেখে ত্যাগ করে চলে গেছেন, তবু রাধিকার কোনো অভিযোগ নেই। "বাঞ্ছিত" কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি রাধিকা বলছেন তিনি যে কৃষ্ণ মন্ত্র পেয়েছেন তাতেই খুশি। তিনি কৃষ্ণ ভজনা করেই তৃপ্ত থাকতে চান। এই কৃষ্ণ ভজনার মাধ্যমেই কৃষ্ণের অস্তিত্ব টের পাবেন এই আশায় রয়েছেন শ্রীমতী।

যাতনায় কত বুকভরা স্নেহ—

"সাধনা আমি পেয়েছি গো।।
তোমাতে পেয়েছি পূজার দেবতা
তোমাতে পেয়েছি মন্ত্রের কথা
ব্যথিত সাধনা সাধিয়া কত না
হে প্রিয় তোমাকে পেয়েছি গো।।" [১১]

আবার "তৃপ্ত" কবিতায় বলছেন—

"ওগো অযাচিত বন্ধু আমার!
কোমল শীতল কর বুলাইয়ে দাও নয়নে আমার।" [১২]

তবু মাঝে মাঝে রাধার অভিমান হয়। তিনি চান কৃষ্ণ একবার দুয়ারে এসে দাঁড়াক। আমি কৃষ্ণের জন্য ভাবছি সে কি আমার কথা একবারো মনে করে না! আমি তো কৃষ্ণের পূজারিণী। একবার হৃদয়ের দরজা খুলে দেখো প্রভু আমি তোমার প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষমান। রাধিকা এও জানিয়েছেন তিনি কখনো দেবপূজা করেননি। তবু আজ সে কৃষ্ণকে হৃদয়েশ্বর মেনে নিয়ে পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন তিনি। এখানেই কবি তারাশঙ্কর ভণিতার বদলে সংযোজন করেছেন রাধার পক্ষ অবলম্বন করে নিজ বক্তব্য— কৃষ্ণ তুমি অকরুণ হয়ো না আর। "পূজারিণী" কবিতা—

"জীবনে কখনও দেবপূজা করা হয়নি তার
এসেছে যদি সে অকরুণ তুমি হয়ো না আর
শুনাতে এসেছে মরম-ব্যথার কথা সে যে
শুন ব্যথা-কথা তার।।"[১৩]

চণ্ডীদাসের রাধা বলছেন—

"কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন

এ দুটি নয়ান-তারা।
হিয়ার মাঝারে পরাণ-পুতলি
নিমিখে নিমিখ হারা।।" [১৪]

সত্যিই তো রাধা কোনোদিন কৃষ্ণ বিনা কারো ভজনা করেননি। এই পদেই অন্যত্র দেখি বিদ্যাপতির সুরে রাধা বলছেন—

"ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে এ তনু বেচিনু
তিল-তুলসী দিয়া।।" [১৫]

দয়িতকে এত নিষ্ঠা সহকারে ভালবাসতে একমাত্র রাধাই পারেন।

পাঁচ

কারো কাছে রাধা আশ্রয় না পেয়ে প্রকৃতির কাছে নিজের দুঃখ ব্যক্ত করেছেন। করেছেন প্রকৃতি বন্দনা ও দোষারোপ। প্রকৃতিই মানুষের মনে জাগ্রত করে কামনা-বাসনা। বর্ষার রূপ রাধার মনেও জাগ্রত করেছে মিলন-তৃষ্ণা। হঠাৎ রাধিকার মনে হল কৃষ্ণ যেন মথুরা থেকে ফিরেছেন, তিনি রথ থেকে নেমে আসছেন তার কাছে। "প্রথম চুম্বন" কবিতায় কবি লিখছেন: কৃষ্ণ রথ থেকে নেমেই রাধিকার কপোলে যেন এঁকে দিয়েছেন প্রথম প্রগাঢ় চুম্বন। এরপরেই আসে সেই চরম মুহূর্ত। "আকিঞ্চন" কবিতায় রাধিকার জবানীতে যা ফুটিয়ে তুলেছেন কবি তারাশঙ্কর। রাধিকার কৃষ্ণমিলন হয়ে গেছে। আর কোনো আশা নেই মনে। এবার তিনি যেতে চান অনন্ত শয়ানে। রাধার এবার প্রয়োজন শান্তিতে চিরনিদ্রা।

প্রথম চুম্বন

"দোলা দিয়ে গাছ-পাতা তোলে ধ্বনি মর্মর
মনে হয় রথ তব এল ওই ঘর্ঘর।।
... ...
দৃষ্টির বেদনায় পাতা এল ঢাকিয়া।
সেই ফাঁকে কপোলেতে গেল চুমা আঁকিয়।।"[১৬]

আকিঞ্চন

"সারাটি দিনের কর্ম সাঙ্গ
হল প্রভু এই সাঁঝে ।
... ...
করিয়া শয়ন দাও ঘুমাইতে
শান্তিতে চিরত।।"[১৭]

চণ্ডীদাসের রাধিকা এমন কোনো অন্তর্ধান চাননি। তিনি থেকে যেতে চেয়েছেন এ ভূলোকে অনন্তকাল।

"সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু

শ্যাম বঁধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে ব'লে
কোন্ অভাগিনী জানি।।
সই, পিরীতি বিষম মানি" [১৮]

রাধার জীবনে দুঃখ এসেছে তবু তিনি কৃষ্ণে মগ্ন। মৃত্যুকে আহ্বান করেননি; করলেও তা কৃষ্ণের প্রতি অভিমানবশত। তাকে প্রণয়ীর বিরাগ বলা যেতে পারে; যা ক্ষণিকেই ভঙ্গ হয়েছে। মাঝে মধ্যে হয়ত কোনো কোনো পদে তিনি পিরিতিকে নানা দোষারোপ করেছেন। গঞ্জনা দিয়েছেন। পিরিতিকে অনল বলেছেন। আবার কখনোবা নিবেদন করেছেন প্রাণনাথের কাছে—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।" [১৯]

চণ্ডীদাসের রাধা জানেন কৃষ্ণ ছাড়া তার কোনো গতি নেই। ওঁর ইহকাল, পরকাল সব কৃষ্ণে সমর্পিত। সে তুলনায় আমাদের মনে হয় তারাশঙ্করের রাধা অতি-স্পষ্টবাদী। হবেই বা না কেন। মনে রাখতে হবে আধুনিকতার মূল বৈশিষ্ট্য প্রশ্ন করা। যেটা বারেবারে করতে পেরেছেন তারাশঙ্করের রাধা। সে তুলনায় চণ্ডীদাসের রাধা আজীবন করেছেন ত্যাগ ও সমর্পণ। অবশ্য এটাও তো অস্বীকার করবার নয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহকে আধুনিক কাব্যের বিষয় করবার সময় নিশ্চয় সহৃদয় কবির মননে ছিল চণ্ডীদাসের পদব্যঞ্জনাই। তাই তো তারাশঙ্করের কবিতাগুলিও তার ভাবব্যঞ্জনায় এতটাই মনোহর হয়ে উঠতে পেরেছে। আমি আলাদা করে আর খোঁজার চেষ্টা করলাম না তারাশঙ্করের রাধায় চণ্ডীদাসের রাধার প্রভাব। আমার মন তা চায়নি কারণ আমি জানি চণ্ডীদাস কবি অগ্রজ এবং কবি তারাশঙ্কর সাত পুরুষের ব্যবধানে আবির্ভূত অনুজপ্রতিম কবি। শিল্পরূপ বিষয়ে আলাদা করে বলবার কিছু নেই আমরা জানি পদ এবং কবিতা এক নয়। উভয় মহাজনের সৃষ্টিই কালোত্তীর্ণ। কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি নিজস্ব শরীরেই ধারণ করে থাকে শিল্পরূপ। চণ্ডীদাসের পদের শিল্পরূপ বহুকালাবধি প্রমাণিত। তবে শিল্পরূপ বিষয়ে পদ ও কবিতার আলোচনা করতে করতে আমি ওদের লেখনীর আঙ্গিক বিষয়ে কিছুটা বলে দিতে পেরেছি বলে মনে হয়। তবেই আমরা দুজনের কবিতাকে আলাদা করে চিনতে পারি। কবিতা বললাম কারণ আমি আমার আলোচনায় সুরের কোনো আলোচনা করিনি। জানি পদ গীতের জন্য কিন্তু আমি সেটাকে 'টেক্সট' হিসাবে আমার আলোচনায় দেখতে ও দেখাতে চেয়েছি।

তারাশঙ্করের প্রথম পর্বের কবিতাতে রয়েছে বর্ণনার প্রাধান্য। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ আমরা সেখানে লক্ষ্য করি। মধ্যপর্বের কবিতা আসলে নব-বৈষ্ণব পদাবলি। অর্থের শব্দ, অতি পর্ব এবং কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ এই পর্বে অতি নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন তিনি। অন্তিম পর্বের নাম 'মুগ্ধবাণী'। এই পর্বে কবি কিছু সামাজিক টাইপ চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা এও জানি এই কাব্যরচনার পরপরই তারাশঙ্কর কাব্যসাধনা ত্যাগ করে ব্যাপৃত হন উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায়। কবি চাইছিলেন আরো সূক্ষ্মভাবে মানুষের কথা তুলে ধরতে সাহিত্যে। আমরা এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য সৃষ্টির ভূমিকা এই 'ত্রিপত্র' কাব্য। এই কাব্যই কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করের জীবনবোধকে সুসংহত ভারসাম্য প্রদান করেছিল।

তথ্যসূত্র :

১. কয়াল অক্ষয়কুমার সম্পাদিত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত , ভারবি, কলকাতা, মাঘ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৫৮
২. মুখোপাধ্যায় সুখময়, রাণা সুমঙ্গল সম্পাদিত, চৈতন্যমঙ্গল, জয়ানন্দ বিরচিত, বাংলা বিভাগ ও গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ভাদ্র ১৪০১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩

৩. শাশমল পশুপতি, আচার্য বুদ্ধদেব সম্পাদিত, বাংলা পুথি ও তার রচয়িতার নাম, বাংলা বিভাগ ও গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, চৈত্র ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫
৪. সাহিত্য-সংহিতা, সপ্তম খণ্ড, নবম সংখ্যা, পৌষ ১৩১৩, সম্পাদক: শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, সহযোগী সম্পাদক: সুবলচন্দ্র মিত্র, সাহিত্য-সভা, ১০৬/১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ. ৫৪৩
৫. চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭৫
৬. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ত্রিপত্র, ইকনমিক্যাল প্রেস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬
৭. ভট্টাচার্য্য অসীম, চৌধুরী বিষ্ণুপদ সম্পাদিত, চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস নানুর, নানুর রামী-চণ্ডীদাস স্মরণ ধর্মসভা, বীরভূম, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৪২২, পৃ. ১৮৭
৮. মিত্র খগেন্দ্রনাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ৫৯
৯. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ত্রিপত্র, ইকনমিক্যাল প্রেস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬
১০. গিরি সত্য, বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৪১৬, পৃ. ৩১১
১১. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ত্রিপত্র, ইকনমিক্যাল প্রেস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬
১২. তদেব
১৩. তদেব
১৪. ভট্টাচার্য্য অসীম, চৌধুরী বিষ্ণুপদ সম্পাদিত, চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস নানুর, নানুর রামী-চণ্ডীদাস স্মরণ ধর্মসভা, বীরভূম, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৪২২, পৃ. ১৯১
১৫. তদেব
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, ত্রিপত্র, ইকনমিক্যাল প্রেস, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬
১৭. তদেব
১৮. ভট্টাচার্য্য অসীম, চৌধুরী বিষ্ণুপদ সম্পাদিত, চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস নানুর, নানুর রামী-চণ্ডীদাস স্মরণ ধর্মসভা, বীরভূম, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৪২২, পৃ. ১৯৩
১৯. মিত্র খগেন্দ্রনাথ, সেন সুকুমার, চৌধুরী বিশ্বপতি, চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ. ৮২